সুব্রত মুখার্জী
ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পি.এইচডি। ইন্ডিয়ান হেল্‌থ ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিসি অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক। কানাডার মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। কানাডিয়ান ইনস্টিটিউটস্‌ অব হেল্‌থ রিসার্চ-এর HOPE ফেলোশিপপ্রাপ্ত এই অর্থনীতিবিদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ করছেন।

স্বাতী ভট্টাচার্য
বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক।

প্রদীপ চক্রবর্তী
ব্যাঙ্গালোরের Oracle University-র অধিকর্তা।

শোভন চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কৃতী ছাত্র। সরকারী আধিকারিক ও সমাজকর্মী।

সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ক্রম ৫ ❑ অক্টোবর ২০১৯

MUKTOMAN
A journal on society & science
মুক্তমন
সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

সম্পাদক
অভীক মৈত্র

প্রচ্ছদ
শুভজিৎ দাস চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
আশা প্রিন্টার্স
রেলপার্ক, রিষড়া

প্রকাশক
অভীক মৈত্র
৪৫ শাস্ত্রীনগর, বড়বহেড়া, নবগ্রাম, হুগলী-৭১২২৪৬
e-mail : *muktoman2018@gmail.com*

পঁচিশ টাকা
(ডাক খরচ অতিরিক্ত)

সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ অক্টোবর ২০১৯

●

সম্পাদকীয় / ৪
বৃদ্ধি বনাম অসাম্য এই অসার বিতর্ক ছেড়ে মনোযোগ দেওয়া হোক সবার জন্য
আরও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির দিকে / মৈত্রীশ ঘটক / ৬
চিন্তার দুর্দশা / গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক / ১০
বৈষম্যের আগুনে ঘি যোগাচ্ছে কালো টাকা / অরুণ কুমার / ২৪
স্বাস্থ্য না চিকিৎসা বাজার / কুমার রাণা / .২৮
অন্বেষণের অভিনবত্ব এনে দিল অর্থনীতির নোবেল / সুকান্ত ভট্টাচার্য / ৩৩
সব ধর্মই কুসংস্কার / মার্কেন্ডে কাটজু / ৩৭
আর্থিক বৈষম্য, সামাজিক মাধ্যম ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা / সুব্রত মুখোপাধ্যায় / ৩৮
প্রেম করে, পণ নিয়ে বিয়ে / স্বাতী ভট্টাচার্য / ৪২
অসাম্যের গণতন্ত্র / প্রদীপ চক্রবর্তী / ৪৮
নারী-পুরুষ সম্পর্কের অর্থনীতি ঃ কেমন আছে ভারতীয় নারী/শোভন চক্রবর্তী/৫২
লেখক পরিচিতি / ৬৩

মৈত্রীশ ঘটক

বৃদ্ধি বনাম অসাম্য এই অসার বিতর্ক ছেড়ে মনোযোগ দেওয়া হোক সবার জন্য আরও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির দিকে

২০১৪ সালে থমাস পিকেটির লেখা ক্যাপিটাল ইন দ্যা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি (Capital in the 21st Century) বইটি ১৯৭০ এর দশক থেকে উন্নত দেশগুলিতে আয়ের বৈষম্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে তুলে ধরেছে। বইটি তথ্য ও পরিসংখ্যানে ভরা একাডেমিক বই হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ঢুকে গেছে এবং অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে। লুকাস চ্যান্সেল (Lucas Chancel) এর সাথে একত্রে লেখা সাম্প্রতিক অন্য একটি প্রবন্ধে থমাস পিকেটি ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

আয়করের তথ্য, পরিবারভিত্তিক সার্ভে এবং জাতীয় একাউন্টস-এর তথ্য সমন্বয় করে পিকেটি এবং চ্যান্সেল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ১৯২২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত আয়ের ও ধনসম্পদের বৈষম্য কোন পথে চলেছে। ১৯২২ সাল থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার আয়করের প্রবর্তন করে, তাই সেই বছর থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে আর বিশ্লেষণের শুরুও তাই সেই বছর থেকেই।

তাঁদের লেখায় যে বিভিন্ন ধরণের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ বাদ দিয়েও বলা যায় তাঁদের মূল সিদ্ধান্ত হল এই যে জাতীয় আয়ে খুব ধনীদের অংশ ১৯৩০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কমেছে। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে তা বাড়তে শুরু করে, আর ২০১৪ সালে তা ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছয়। একই সময়কালে জনগণের নিম্নতম (আয়ের নিরিখে) অর্ধেক অংশের ও মধ্যবিত্তের জাতীয় আয়ে অংশ ঠিক এর বিপরীত ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে ২০১৪ সালই তাঁদের আলোচনার শেষ বছর, যদিও ভাবার কোনও কারণ নেই যে এই মূল প্রবণতা গত পাঁচ বছরে পাল্টেছে।

এইভাবে লেখকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারতবর্ষে ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত জাতীয় আয়ে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের তুলনায় উচ্চতম আয়ের মানুষের ভাগ যা ছিল তা এখনকার তুলনায় কম। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নানারকম কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল, আর ছিল প্রগতিশীল (বা,

ক্রমবর্ধমান হারের) রাজস্বব্যবস্থা (fiscal progressivity) যাতে ধনীদের আয়ের ওপর কর বা রাজস্বের হার এখনকার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিল। কিন্তু রাজীব গান্ধীর সময়কালে এই প্রবণতা বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। কারণ ব্যবসার সহায়ক নীতি গ্রহণ। এই প্রবণতা প্রসারিত হল অর্থনৈতিক সংস্কার পর্যন্ত। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের বৈষম্য ও দারিদ্রের উপর প্রভাব কি হল লেখকরা সেই পুরনো বিতর্কে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বলে লিখেছেন। কিন্তু যেভাবে লেখকরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় হাজির করেছেন, তাতে মনে হতে পারে যে কম বৃদ্ধি এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ ভালো কারণ তা বৈষম্য কমিয়ে রাখে। ঠিকই, তা বৈষম্য কমিয়ে রাখে। কিন্তু তা গড়পড়তা আয়ও কমিয়ে রাখে এবং বেশি সংখ্যক মানুষকে দারিদ্রসীমার নীচে রাখে। ছাদের বাগানে টবে রাখা সব গাছই ছোট — তাতে বৈষম্য নেই, কিন্তু বিকাশের কোন সম্ভাবনাও নেই। তাই 'অর্থনৈতিক সংস্কার খারাপ' বা 'এর থেকে লাইসেন্স-কন্ট্রোল জমানা ভাল ছিল' এই মনোভাব কিন্তু আর যাই হোক, প্রগতিশীল নয়।

আয়ের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে গেলে সাইমন কুজনেটসের কাজের কথা না উল্লেখ করলে চলে না। কুজনেটস্ ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রথমে বৈষম্য বাড়ায়, এবং তারপর বৈষম্য কমায়। পরবর্তীকালে জাতীয় আয় ও আর্থিক বৈষম্যের মধ্যে এই সম্পর্কটি কুজনেটস্ কার্ভ (Kuznets Curve) নামে পরিচিত হয়। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে যারা তুলনায় ধনী তারা নতুন সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। এই সময়ে অদক্ষ শ্রমের অধিক যোগান গড়পড়তা মজুরী কমিয়ে রাখে। কিন্তু পুঁজির সঞ্চয় যত হতে থাকে শ্রমের চাহিদা বাড়তে থাকে। তাতে মজুরী বৃদ্ধি হয়, এবং আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষেরাও পেতে শুরু করেন। এছাড়াও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানব সম্পদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে দক্ষ শ্রমের চাহিদা বাড়ায়, যাতে আয় বৃদ্ধির সুফল আরও বেশি করে কিছু শ্রেণি যারা শিক্ষা বা দক্ষতায় বিনিয়োগ করতে সক্ষম তারাও পেতে শুরু করে। এই সমস্ত কিছুর পরিণামে বৈষম্য কমে।

পিকেটি এবং চ্যান্সেলের প্রবন্ধে পরিষ্কারই লেখা আছে যে সময়ে বৈষম্য ক্রমহ্রাসমান ছিল সেই সময়ে গড়পড়তা আয়ের বৃদ্ধির হার কম (low) ছিল। পরবর্তীকালে বৈষম্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারও বাড়ে। প্রবন্ধের এই অংশটি অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, এবং লেখকেরাও এইদিকে বেশি নজর দেননি। যাইহোক, গড় আয়বৃদ্ধির হার বেড়েছে যেমন সত্যি, তেমন ধনীদের আয়বৃদ্ধির হার মধ্যবিত্ত এবং অবশ্যই সর্বনিম্ন অর্ধেক জনসংখ্যার আয়ের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি, একথাও সত্যি। এই তথ্যই আয়বৃদ্ধির সাথে বৈষম্যের প্রবণতার বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেয় এবং কুজনেটস্ এর মৌলিক যুক্তির বৈধতাকে প্রদর্শন করে।

আয়বৃদ্ধির পথ বন্ধ না করে বৈষম্যের মাত্রাছাড়া বৃদ্ধি কমাতে কি করা যায়? পিকেটি ও চ্যান্সেলের প্রবন্ধটি অবাঞ্ছিত (undesirable) বৈষম্য বনাম স্বাভাবিক বৈষম্যকে আলাদা করে শনাক্ত করার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমটির কারণ হল ধনীরা দরিদ্রের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ পান সেই কারণে, যা অর্থনৈতিক দক্ষতা বা সামাজিক ন্যায় কোনোদিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। দরিদ্রশ্রেণির মধ্যে যে প্রতিভা বা দক্ষতা তার বিকাশ না হওয়া আর্থিক বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার ধনীরা বিলাসে জাবনযাপন করবেন, আর দরিদ্ররা কোনমতে বেঁচে থাকবেন, তা মানবিক দিক থেকে কাম্য নয়।

দ্বিতীয় ধরণের বৈষম্য আসে সবাইকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া স্বত্ত্বেও দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের পার্থক্যের কারণে। একই অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত পরিবেশ থেকে আসলেও যেমন সব ছাত্রের দক্ষতা, উদ্যোগ বা পরিশ্রম সমান হয়না আর সেই কারণে তাদের পরীক্ষার ফলও একরকম হয়না, বৃহত্তর অর্থনৈতিক জগতেও সেই কথাটা সত্যি। সমান সুযোগ পেয়েও সবাই তার সমান সদ্ব্যবহার করতে পারেনা, আর তাই সবার অর্থনৈতিক সাফল্য এক হবে, তা আশা করা যায় না।

প্রথম ক্ষেত্রে একজনের পরিবেশ তার সুযোগ পাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই একজনের যোগ্যতা বেশি হলেও, পরিবেশ বা সুযোগের অসাম্যের কারণে তারা পিছিয়ে থাকতে পারে। সুযোগ যদি সমভাবে বন্টিত না হয় তাহলে পুরুষানুক্রমিক বৈষম্য বজায় থাকে। এই সুযোগের অসাম্য সামাজিক ন্যায় বা অর্থনৈতিক দক্ষতা কোন দিক থেকেই কাম্য নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খানিক বৈষম্য অবধারিত এবং তা অবাঞ্ছনীয় নয়। আয়ের অসাম্য সব সময়েই আমাদের চোখে লাগে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির অসাম্যও কি একই গোত্রের নয়? একজন বিখ্যাত লেখক বা চিত্রপরিচালক যে বাকিদের থেকে বেশি সম্মান বা খ্যাতি পান, তা কি অনর্জিত না অবাঞ্ছনীয়? তাই যে কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকতর সুযোগ তৈরী হলেও তা বৈষম্যও ডেকে আনতে পারে।

বর্তমান কালে প্রগতিশীল নীতি সমূহের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টির বৃহত্তর সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং সুযোগ সৃষ্টিকে ব্যাহত না করা। এর থেকে ফলাফলের বৈষম্যও কমবে, আর সবচেয়ে বড় কথা, চরম দারিদ্র কমবে, যা আমাদের মত দেশে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর তার থেকে তৈরি হওয়া সুযোগের বিস্তার আমাদের শত্রু নয়। সমালোচনা হতেই পারে যে অর্থনৈতিক সংস্কার বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে খোদ প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টের (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে জনসংখ্যার ৪৫% দারিদ্রসীমার নীচে ছিল। এই শতকরা হিসাব বর্তমানে অর্ধেক হয়েছে, যার অর্থ হল ২০ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছেন। সবাইকে চেপে রাখলে বৈষম্য হয়ত কমে কিন্তু তাতে দারিদ্রের সমস্যার

সুরাহা হয়না।

কিন্তু আত্মতুষ্ট হবার আগে এও ভেবে দেখা দরকার যে দারিদ্রসীমার হিসাবে যে আয়ের স্তরকে ধরে করা হয়েছে তার মানকে যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে তিন দশকের উচ্চহারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনগণের প্রায় ৮০% এই দারিদ্রসীমার চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। এর থেকে বোঝা যায় দারিদ্রসীমার মান কতটা রক্ষণশীল ভাবে ধরা হয়। অতএব হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির থেকে উঠে আসা উদ্বৃত্তের বন্টন নিয়ে ভারতবর্ষে বড় রকমের বৈষম্যের সমস্যা আছে। এই সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার এবং আরও বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে সচেতন প্রচেষ্টা চালানো দরকার যাতে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা উন্নয়নের সোপান বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে পারে। এছাড়াও প্রয়োজন ধনীদের করের আওতায় আনতে সচেতন প্রয়াস। বিশেষত, উত্তরাধিকার কর যা সুযোগের বৈষম্যের যেটি প্রধান উৎস সেই সম্পদের বৈষম্যকে বাড়তে দেয় না।

উদ্যোগের বিস্তার বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সমস্যা নয়, তার সুযোগ নেবার ক্ষমতার বৈষম্য হল মূল সমস্যা। তাই ফলাফলের নয়, সুযোগের বৈষম্যের বিলোপ হওয়া উচিত প্রগতিশীল নীতির মূল ভিত্তি।

(লেখকের "India needs to create greater economic opportunities for all" The Economic Times, October 9, 2017 প্রবন্ধের অনুদিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।)

উৎস নির্দেশিকা

Indian Income Inequality, 1922-2014 : From British Raj to Billionaire Raj?, World Inequality Database Working Paper Series No. 2017/11, Paris.
https://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/
Report of the Expert Group to Review the Methodology for Estimation of Poverty (2009) Planning Commission;
http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_pov.pdf